



Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)

A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture

Volume - v, Issue - iii, Published on July issue 2025, Page No. 802 - 808

Website: <https://tirj.org.in>, Mail ID: info@tirj.org.in

(SJIF) Impact Factor 7.998, e ISSN : 2583 - 0848

শিক্ষার অগ্রগতিতে স্বামী বিবেকানন্দ

সুকোমল জানা

গবেষক, দর্শন বিভাগ

সিকম ক্লিন্স ইউনিভার্সিটি, বীরভূম, পশ্চিমবঙ্গ

Email ID : sukomaljana144@gmail.com

Received Date 25. 06. 2025

Selection Date 20. 07. 2025

Keyword

The meaning of education, character building, physical education, universal religion, women's education, welfare of the world, purity, public development.

Abstract

Swami Vivekananda believed that education is a manifestation of perfection which is within humans. He thought that it was very painful or distressing that the contemporary education system did not help people stand on their own feet, Not did it help instill self-reliance and self-respect in people. Vivekananda did not consider education as a collection of information. For him, education was more than that. He considered education as a means of making people, of standing on their own feet, of giving life and of shaping character. He considered education to be a collection of great thoughts. Swami Vivekananda was in favor of giving people only positive education because he believed that negative thoughts weaken people and help them stray away from the path of education. He said that if young children are encouraged and not constantly blamed, they will find happiness. According to Vivekananda, only positive education should be given to them. Swami Vivekananda met Ramakrishna dev in 1881, and this transformed his life. He was initially skeptical of Ramakrishna's teachings, but after some hesitation, he surrendered to Ramakrishna and accepted him as a friend, philosopher, and guide. Immediately after Ramakrishna dev's death in 1886, he traveled extensively throughout India, and through this he became fully informed about the social and economic conditions of the country. He felt that despite the inherit high spirituality and a very significant cultural history, problems like poverty, impotence, and social crime or sin could not be completely eradicated in India. He deeply felt the need to bring about a spiritual revolution and also realized that to bring about such a revolution, very courageous spiritual leadership was needed. The social system of 19th-century India was entangled in the web of caste, creed, and religion. In order to free the society from the shackles of caste and religion, in the current social situation, I feel that Swamiji's dream, that all classes of society will one day be united, needs to be brought to the forefront; bringing the poor, underdeveloped, or backward people of society. My discussion of 'progress in education' with Swamiji will become relevant in the present day.

Discussion

ঊনবিংশ শতকের বিভিন্ন মনীষীদের মধ্যে স্বামী বিবেকানন্দ ছিল শিক্ষার অন্যতম অগ্রদূত। যিনি ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত হয়েও ভারতবর্ষের সমাজকে শিক্ষার মাধ্যমে জ্ঞানের আলো জ্বালাতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দের শিক্ষা চিন্তা বা শিক্ষায় স্বামী বিবেকানন্দের অবদান আজও বিশেষ প্রশংসার দাবি রাখে। শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের প্রিয় শিষ্য ও যুগপুরুষ স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন ঊনবিংশ শতকের এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। যার আলোতে আলোকিত হয়ে সমাজ ব্যবস্থা আলোকিত হয়েছিল। অর্থাৎ শিক্ষার মাধ্যমে সমাজের গতি নির্ধারণ হয়েছিল। স্বামী বিবেকানন্দের সন্ন্যাস গ্রহণের আগের নাম নরেন্দ্রনাথ।

“কলকাতার সিমলা অঞ্চলে দত্ত বংশে ১৮৬৩ সালের ১২ই জানুয়ারী বিবেকানন্দের জন্ম হয়। পিতার নাম ‘বিশ্বনাথ দত্ত, মাতার নাম ভুবনেশ্বরী। ভুবনেশ্বরী রূপে গুণে ছিলেন অতুলনীয়। বুদ্ধিমতী ও দেবভক্তি পরায়ণা।”^১

নরেন্দ্রনাথের পিতামহ ‘দুর্গাচরণ দত্ত সর্বদা দিন কাটাতেন সাধু সঙ্গে, তাঁদের সেবা করতেন। তাঁর পিতার ন্যায় তিনিও আইন ব্যবসায়ে প্রচুর নাম করেন কিন্তু যশের প্রতি তাঁর লোভ ছিল না। পঁচিশ বৎসর বয়সে সংসার পেছনে ফেলে দুর্গাচরণ একদিন গৃহত্যাগ করলেন। স্বামী বিবেকানন্দ পাশ্চাত্য ভাবনায় দীক্ষিত হওয়ার সাথে সাথে ভারতীয় শাস্ত্রেও তিনি ভালো পাঠ গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর প্রারম্ভিক মানসিক গঠন ছিল বুদ্ধিবাদ ও সংশয়বাদের সমন্বিত রূপ।

শিক্ষার অর্থ : স্বামী বিবেকানন্দের মতে – শিক্ষা হল শিশুর অন্তর্নিহিত সত্তার পরিপূর্ণ বিকাশ সাধন। (“Education is the manifestation of perfection already in man.”^২) অর্থাৎ শিশুর মধ্যে যে সুপ্ত সম্ভাবনা আগে থেকে বিদ্যমান তার পরিপূর্ণ বিকাশ সাধন হল শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য। শিক্ষা হচ্ছে, মানুষের ভিতর যে পূর্ণতা প্রথম হতেই বর্তমান তারই প্রকাশ। মানবের ভিতরে যদি জ্ঞান ও শক্তির অনন্ত প্রস্রবণ বিদ্যমান না থাকিত, তাহা হইলে সহস্র চেষ্টাতেও সে কখনও জ্ঞানী ও শক্তিমান হইতে পারিত না। আমাদের প্রত্যেকের ভিতর— কি ক্ষুদ্র পিপীলিকা, কি স্বর্গের দেবতা— সকলেরই ভিতর অনন্ত জ্ঞানের প্রস্রবণ রয়েছে। জ্ঞান স্বতই বর্তমান রয়েছে, মানুষ কেবল সেটা আবিষ্কার করে মাত্র। এই জ্ঞান আবার মানুষের অন্তর্নিহিত। আমরা যে বলি মানুষ ‘জানে’, ঠিক মনোবিজ্ঞানের ভাষায় বলতে গেলে বলতে হবে — মানুষ ‘আবিষ্কার করে’ (discovers) বা ‘আবরণ উন্মোচন করে’ (unveils)। মানুষ যা ‘শিক্ষা করে’, প্রকৃতপক্ষে সে তা ‘আবিষ্কার করে’। ‘Discover’ শব্দটির অর্থ— অনন্ত জ্ঞানের খনিস্বরূপ নিজের যে আত্মা তার আবরণ সরিয়ে নেওয়া।^৩ স্বামী বিবেকানন্দের মতে, শিক্ষা হল কেবল তথ্যজ্ঞান অর্জন নয়, বরং মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তি ও সম্ভাবনাকে জাগ্রত করে সামগ্রিক বিকাশ ঘটানো। তিনি বিশ্বাস করতেন যে শিক্ষা হল চরিত্র গঠন, নৈতিক মূল্যবোধ বৃদ্ধি, এবং বুদ্ধির বিকাশের মাধ্যম। তিনি শিক্ষার লক্ষ্য হিসেবে নিজের সম্ভাবনাকে উপলব্ধি করা এবং মানবতার সেবা করাকে মনে করতেন।

শিক্ষার উদ্দেশ্য : স্বামী বিবেকানন্দের মতে শিক্ষার উদ্দেশ্য হল চরিত্র গঠন করা, এবং নিজের পায়ে দাঁড়ানো, মানুষের মধ্যে আধ্যাত্মিক ও মানসিক শক্তি বৃদ্ধি করা। তিনি মনে করতেন যে শিক্ষা কেবল তথ্য অর্জন নয়, বরং এটি মানুষের মধ্যে আত্ম-সচেতনতা, মানবতা এবং বিশ্বভ্রাতৃত্বের ধারণা তৈরি করতে সাহায্য করে। আমরা দেখেছি যে, স্বামীজীর মতে প্রকৃত শিক্ষার উদ্দেশ্য হল মানুষ গড়া। সুতরাং শিক্ষা কখনই তথ্য ভিত্তিক হতে পারে না। কারণ এ ধরনের শিক্ষা তোতাপাখিরই সৃষ্টি করে — ক্রমে তাদের যন্ত্রবৎ করে তোলে। অতএব যে শিক্ষা আমাদের পক্ষে প্রয়োজনীয় তা মানুষ - গঠনকারী, চরিত্র গঠনকারী, ধ্যানধারণার সমন্বয় না হয়ে পারে না।^৪ পরিপূর্ণ অবস্থায় দেহ, মন ও আত্মার পূর্ণ সঙ্গতিসাধনে সমর্থ না হলে শিক্ষাব্যবস্থাকে পূর্ণাঙ্গ আখ্যা দেওয়া যায় না। গ্রীকদের আদর্শ ছিল সুন্দর দেহাভ্যন্তরে একটি সুন্দর মন। শিক্ষা সম্পর্কে স্বামী বিবেকানন্দের অভিমত -

শিক্ষা সম্পর্কে স্বামী বিবেকানন্দের অভিমতসমূহকে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করে আলোচনা করা হল। যথা - শারীরিক শিক্ষা। স্বামী বিবেকানন্দের মতে শারীরিক শিক্ষা হল এমন একটি প্রক্রিয়া যা ব্যক্তির শারীরিক, মানসিক এবং আধ্যাত্মিক উন্নতি ঘটায়। স্বামী বিবেকানন্দ জোর দিয়েছিলেন যে শারীরিক শিক্ষা শুধুমাত্র শারীরিক কার্যকলাপের সীমাবদ্ধতা নয়, বরং এটি জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ।

স্বামী বিবেকানন্দের শিক্ষার সংজ্ঞা ব্যাপক, যা শুধু জ্ঞান অর্জনের উপর সীমাবদ্ধ নয়। তিনি মনে করতেন যে শিক্ষা হল ব্যক্তির মধ্যে বিদ্যমান পূর্ণতাকে প্রকাশ করার একটি মাধ্যম। তিনি বিশ্বাস করতেন যে শিক্ষা হল মানুষের মধ্যে আত্ম-সচেতনতা এবং আত্ম-নির্ভরতা তৈরি করা, যা তাদের জীবনকে উন্নত করতে পারে। কোনো বিষয়বস্তু যথাযথ অনুধাবনের জন্য শারীরিক ও মানসিক সবলতা আবশ্যিক। সুস্থ দেহেই সুস্থ মন থাকে। শারীরিক শিক্ষার জ্ঞান ছাড়া শারীরিক ও মানসিক সবলতা লাভ করা যায় না। তাই বিবেকানন্দ শিক্ষাক্রমে শারীরিক শিক্ষার ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি বলেন, “তোমাদের প্রথমত সবল হইতে হইবে, ধর্ম পরে আসিবে। হে আমার বন্ধুগণ, তোমরা সবল হও – ইহাই তোমাদের প্রতি আমার উপদেশ। গীতাপাঠ অপেক্ষা ফুটবল খেলিলে তোমরা স্বর্গের অধিকতর নিকটবর্তী হইবে। শরীর শক্ত হইলে তোমরা গীতা অপেক্ষাকৃত ভাল বুঝিবে।” শারীরিক শিক্ষা, বিবেকানন্দের দর্শনে, একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তিনি মনে করতেন যে শারীরিক কার্যকলাপের মাধ্যমে মানুষ তাদের শারীরিক শক্তি, স্বাস্থ্য এবং কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি করতে পারে। একই সাথে, শারীরিক শিক্ষার মাধ্যমে মানুষ শৃঙ্খলা, সহনশীলতা এবং আত্ম-নিয়ন্ত্রণ অর্জন করতে পারে, যা তাদের সামগ্রিক বিকাশে সাহায্য করে।

ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা : বিবেকানন্দ মনে করতেন, ধর্ম কেবল আনুষ্ঠানিকতা বা বিশ্বাস নয়, বরং এটি মানুষের চরিত্র গঠনের জন্য একটি শক্তিশালী মাধ্যম। তিনি জোর দিয়েছিলেন, ধর্মীয় শিক্ষা মানুষের মধ্যে সহনশীলতা, অন্যের প্রতি সহানুভূতি এবং সামাজিক দায়িত্ববোধ তৈরি করতে সাহায্য করে। বিবেকানন্দ নৈতিক শিক্ষার ওপর বিশেষভাবে গুরুত্ব দিয়েছিলেন, যা মানুষের মধ্যে ভালো গুণাবলী যেমন - সত্য, পবিত্রতা, সততা, অধ্যবসায়, সাহস, শক্তি, প্রেম, সকলের প্রতি সহানুভূতি এবং সেবা, নম্রতা এবং ভদ্রতা গড়ে তোলে। স্বামী বিবেকানন্দের অসাধারণ ঐতিহাসিক প্রজ্ঞা সহজেই ‘নীতি, শিল্পকলা, সাহিত্য ও বিজ্ঞানের আদিম বিকাশভূমি’ ভারতবর্ষের বাহ্য ও আন্তর্য্যাপেক্ষ নির্ণয় করেছিল সুনিপুণভাবে। একজন গৌরবান্বিত ভারতবাসীর ন্যায় তিনি পাশ্চাত্যের বুধমণ্ডলীকে বলেছিলেন - তোমাদের ধর্ম যখন কল্পনাতেও উদ্ভূত হয় নাই, তাহার অন্ততঃ তিনশত বৎসর আগে আমাদের ধর্ম সুপ্রতিষ্ঠিত।^৫ স্বামী বিবেকানন্দের মতে, - ধর্ম সর্বজনীন হওয়া উচিত এবং এটি সকলের মঙ্গল সাধন করে। তিনি সকল ধর্মের মধ্যে সহনশীলতার শিক্ষা দিতে এবং বিভিন্ন ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে উৎসাহিত করতেন।

শ্রী-পুরুষ নির্বিশেষে শিক্ষাপ্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন যে, শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় না যদি ধর্মকে বাদ দেওয়া হয়। তবে ধর্ম বলতে ‘অন্তর্নিহিত দেবত্বের বিকাশ’ - এর কথাই বলেছেন তিনি। “উপায় শিক্ষার প্রচার।” স্বামী বিবেকানন্দের মতে, শিক্ষার অর্থ অন্তরের বিকাশ। স্বামী বিবেকানন্দের দৃষ্টিতে শিক্ষা ও ধর্ম এক, — উভয়েরই লক্ষ্য মানুষের অন্তর্নিহিত সম্ভাবনার উপলব্ধি। শিক্ষা বলতে তিনি বুঝেন মনুষ্যত্বের উদ্বোধন এবং তার সহিত ধর্মের একটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক তো থাকবেই। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন, - “খালিপেটে ধর্ম হয় না,” তাই ভারতের অন্যতম প্রধান ও প্রথম কর্তব্য হইবে দরিদ্রের অন্নবস্ত্রের ব্যবস্থা করা।^৬

মানুষ গড়া বা মানুষ তৈরির শিক্ষা : স্বামী বিবেকানন্দের মতে প্রকৃত শিক্ষার উদ্দেশ্য হল মানুষ তৈরি করা। বুদ্ধিতে যা গ্রহণ করলাম, বাস্তব প্রয়োজনে জীবনে তা কাজে লাগাবার নামই শিক্ষা। “মাথায় কতকগুলি ভাব ঢুকাইয়া সারাজীবন হজম হইল না, অসম্বদ্ধভাবে মাথায় ঘুরিতে লাগিল, ইহাকে শিক্ষা বলে না। ... বিভিন্ন ভাবগুলিকে এমনভাবে হজম করিয়া লইতে হইবে, যাহাতে আমাদের জীবন গঠিত হয়, যাহাতে মানুষ তৈরি হয়, চরিত্র গঠিত হয়। যদি তোমরা পাঁচটি ভাব হজম করিয়া জীবন ও চরিত্র গঠন করিতে পার, তবে যে ব্যক্তি একখানা গোটা লাইব্রেরি মুখস্থ করিয়াছে, তাহার অপেক্ষাও তোমার অধিক শিক্ষা হইয়াছে বলিতে হইবে।” “সকল শিক্ষা-প্রণালীর লক্ষ্য হওয়া উচিত মানুষ তৈরি করা।” “যাহা জনসাধারণকে জীবনসংগ্রামের উপকরণ জোগাইতে সহায়তা করে না, তাহাদের মধ্যে চরিত্রবল, লোকহিতৈষণা এবং সিংহের মত সাহস উদ্ভূত করিতে সহায়তা করে না, তাহা কি শিক্ষা নামের যোগ্য?”

গান্ধীজী শিক্ষাকে এইভাবে সংজ্ঞায়িত করেন, - “শিক্ষা বলতে আমি বোঝাতে চাই শিশু ও মানুষের দেহ, মন ও আত্মায় নিহিত যা কিছু মহত্তম সেগুলিকে সর্বাঙ্গিকভাবে টেনে বের করা।”

নারী শিক্ষা : রাজা রামমোহন রায়, বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ ভারতীয় শিক্ষাবিদ ও সমাজ সংস্কারকদের মতো বিবেকানন্দ ছিলেন ভারত গড়ার কারিগর। তিনি একদিকে যেমন নতুন ভারত গঠনের মঞ্চে সবাইকে দীক্ষিত করতে চেয়েছিলেন তারই পাশাপাশি নারী শিক্ষার বিস্তার সাধন করতে চেয়েছিলেন। তাই তিনি বেলেড় মঠের সমান্তরালে নারীদের শিক্ষার বিস্তারে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। বিবেকানন্দ বলেছেন, স্ত্রী-পুরুষ উভয়ের মধ্যেই ব্যাপকভাবে শিক্ষার প্রসার সর্ববিধ উন্নতির ও সর্ববিধ সমস্যা সমাধানের প্রশস্ততম উপায়। পুরুষদের মতো স্ত্রীলোকের ভিতরেও শিক্ষার প্রসারের কথা বিবেকানন্দ বারে বারে বলেছেন। “এক পক্ষে পক্ষী উড়িতে পারে না”। “মেয়েদের ভেতর শিক্ষাবিস্তার না হলে কিছু হবার জো নাই।” নারী শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে বিবেকানন্দ মনে করেন যে গ্রামে গ্রামে বিদ্যালয় স্থাপন করতে হবে। অর্থাৎ গ্রামাঞ্চলের মেয়েদেরকে সুশিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে হলে প্রথমে বিদ্যালয়ে স্থাপন করতে হবে। তাই নারী শিক্ষায় বিবেকানন্দের অবদান হল গ্রামে গ্রামে বিদ্যালয় স্থাপন। স্বামী বিবেকানন্দের নারী শিক্ষার ভিত্তি ছিল আধ্যাত্মিক ও নৈতিক আদর্শ। তিনি প্রাচীন ভারতীয় নারী সিতা, সাবিত্রী, খনা, লীলাবতী, গার্গী প্রমুখ নারীদের আদর্শকে সামনে রেখে নারী শিক্ষার আবশ্যিকতাকে স্বীকার করেছিলেন। “ভারতবর্ষে কোনও নারীকে আশীর্বাদ করবার সময় বলা হয় — সীতার মতো হও।”^১ নারী শিক্ষার বিস্তারের ক্ষেত্রে বিবেকানন্দ বলেন – আমাদের দেশের মেয়েরা বিদ্যাবুদ্ধি অর্জন করুক এ আমি খুবই চাই। কিন্তু পবিত্রতা বিসর্জন দিয়ে যদি তা করতে হয়, তবে তা নয়। “যাদের মা শিক্ষিতা ও নীতিপরায়ণা হন, তাদের ঘরেই মহৎ লোক জন্মায়। ... মেয়েদের আগে তুলতে হবে, আপামর জনসাধারণকে জাগাতে হবে, তবে তো দেশের কল্যাণ!” “জননীগণ উন্নত হইলে তাঁহাদের কৃতী সন্তানবর্গের মহৎ কীর্তি দেশের মুখ উজ্জ্বল করিতে পারিবে, এবং তখনই ঘটিবে দেশে সংস্কৃতি, পরাক্রম, জ্ঞান ও ভক্তির পুনরুজ্জীবন।” “যথার্থ সুশিক্ষা পাইলে আমাদের মেয়েরা জগতের আদর্শ নারী হইয়া উঠিতে পারে।” স্বামী বিবেকানন্দের মতে ‘স্বাবলম্বন ও পারস্পরিক সহায়তা’র (self-help and mutual aid) মাধ্যমে নারীদের বিশেষ সমস্যার সমাধান হতে পারে। তার জন্য প্রয়োজন নারীকে নারী করে গড়ে তোলার শিক্ষা, যে শিক্ষা তাদের মধ্যে নির্ভিকতা এবং স্বাবলম্বনের ভাব গড়ে তুলবে। ফলে স্ত্রীশিক্ষার পাঠ্যক্রমে থাকবে ধর্মশাস্ত্র, সাহিত্য, সংস্কৃত ব্যাকরণ এবং কিছু ইংরেজি। তা ছাড়া এই শিক্ষাসূচির তালিকায় তিনি আরও যোগ করেছেন রন্ধনবিদ্যা, সূচীশিল্প, গার্হস্থ্যবিজ্ঞান ইত্যাদি। এ প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে যে - স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দের নির্দেশ ছিল এক শতাব্দীর বেশি আগে, যখন গার্হস্থ্যবিজ্ঞান প্রভৃতি স্ত্রীশিক্ষার বিশেষ পাঠ্যক্রমভুক্ত হয়নি। বিবেকানন্দ শুধু ধর্মপ্রচার বা তাঁর গুরু কীর্তিগান করবার জন্যই এসেছিলেন তা নয়। একদা প্রসিদ্ধিত জনসাধারণের মধ্যে যে ক্লীবত্ব ভীৰুতা আত্মমর্যাদা বোধ বিদেশীর কৃপালাভে ব্যাকুল বাঙালীর তথা ভারতবাসীর মনে কালী লেপন করছিল তার উচ্ছেদ করেছেন অমিত শক্তিতে, দেশবাসীর মনে নব জাগরণের সুষ্ঠু চিন্তার সঙ্গে ধর্মবোধের ও সেবার সমন্বয়ে স্বাধীনতা বোধকেও জাগ্রত করে তুললেন। ভারতীয় নারীত্বকে স্বস্থানে পুনরুজ্জীবিত করলেন। বাঙালীর স্বাধীনতার চেতনা বোধ, নারীদের শিক্ষা বিকাশ হিন্দুধর্মের অপার গৌরব, মানসিক বল প্রভৃতি সকল কিছুর মূলেই এই দৃষ্ট-পুরুষ সন্ন্যাসীর সাধনা রয়ে গেছে। যিনি সমস্ত জীবন দিয়ে আদর্শ আর ত্যাগের ধ্বজা উড়িয়ে একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্তে পরিণত হলেন। তিনি যেমন একাধারে রামকৃষ্ণের মতো গুরু পেয়েছেন — তেমনি তার মতো শিষ্য প্রত্যেক গুরুরই কাম্য, একথা তাঁর প্রতি শ্রীরামকৃষ্ণের অকুপণ স্নেহ আশীর্বাদ প্রভৃতিতে সুস্পষ্ট হয়ে আছে।

স্ত্রীশিক্ষার যে আদর্শ স্বামীজী আমাদের সামনে তুলিয়াছেন তাহার মূলে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের প্রেরণা রহিয়াছে। এক তর্কিকের প্রতি ঠাকুরের একটি উক্তি এই প্রসঙ্গে বিশেষ করিয়া স্মরণ রাখা কর্তব্য - “যদি এক কথায় বুঝতে পার ত আমার কাছে এস, আর খুব তর্কযুক্তি করে যদি বুঝতে চাও, ত কেশবের (কেশবচন্দ্র সেন) কাছে যাও।” এই ‘এক কথা’কে যদি আক্ষরিক অর্থে নিতে পারি তাহা হইলে বলা যায় যে এই কথাটি ‘মা’। শ্রীরামকৃষ্ণ এই একাক্ষর মন্ত্রের সাহায্যে অপূর্ব দিব্য জীবনের সন্ধান দেখাইলেন। স্বামীজী এই মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া নারী জীবনের যে আদর্শ উপস্থাপিত করিলেন, তাহাই তাঁহাদের একমাত্র আদর্শ। নারীর মর্যাদা, নারীর শিক্ষা ও নানাবিধ উন্নয়নের জন্য স্বামীজী যে কর্মসূচী প্রণয়ন করিয়াছেন তাহার মূল্য আজিকার যুগসংক্রান্তির ক্ষণে অপরিসীম।

সমাজের সুবিধা বঞ্চিতের শিক্ষা : স্বামী বিবেকানন্দ সমাজের সুবিধা বঞ্চিত জনগণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের প্রয়োজনীয়তার কথা বারংবার উল্লেখ করেছেন। বলেছেন - “প্রত্যক্ষ দেখিতেছি, যে জাতির মধ্যে জনসাধারণের ভিতর বিদ্যা-বুদ্ধির যত বেশি প্রসার, সে জাতি তত বেশি উন্নত। ভারতবর্ষে যে সর্বনাশ হইয়াছে, তাহার মূল কারণ ওইটি — রাজশাসন ও দম্বলে দেশের সমগ্র বিদ্যাবুদ্ধি এক মুষ্টিমেয় লোকের মধ্যে আবদ্ধ করা। যদি পুনরায় আমাদিগকে উঠিতে হয়, তাহা হইলে ঐ পথ ধরিয়া অর্থাৎ সাধারণ জনগণের মধ্যে বিদ্যার প্রচার করিয়া।” “সমস্ত ক্রটির মূলই এইখানে যে, সত্যিকার জাতি — যাহারা কুটিরে বাস করে, তাহারা তাহাদের ব্যক্তিত্ব ও মনুষ্যত্ব ভুলিয়া গিয়াছে। ... তাহাদের লুপ্ত ব্যক্তিত্ববোধ আবার ফিরাইয়া দিতে হইবে; তাহাদিগকে শিক্ষিত করিতে হইবে।”

বিবেকানন্দ জনসাধারণকে সাধারণজ্ঞান শিক্ষা দেওয়ার আবশ্যিকতাই বিশেষ ভাবে অনুভব করেছিলেন। জনসাধারণের সুবিধা মত সময়ে তাদের কাছে গিয়ে মুখের কথায় গল্পের ছলে জ্যোতিষশাস্ত্র, ভূগোল প্রভৃতি তাদের বুদ্ধির উপযোগী করে সহজ সরল ভাষায় শেখাতে বলেন। স্বামী বিবেকানন্দের মতে, শিক্ষা হল সমাজের সবচেয়ে শক্তিশালী পরিবর্তনকারী শক্তি। তিনি মনে করতেন যে শিক্ষা কেবল বই-পড়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বরং এটি মানুষের জীবনকে উন্নত করতে, তাদের মধ্যে আত্ম-সচেতনতা তৈরি করতে এবং সমাজের সব স্তরের মানুষের মধ্যে জ্ঞান ও প্রজ্ঞা ছড়ানোতে সাহায্য করে। তিনি বিশেষভাবে সুবিধা বঞ্চিত মানুষের শিক্ষার উপর জোর দিয়েছিলেন। বিবেকানন্দ বিশেষভাবে সমাজের পিছিয়ে পড়া, দরিদ্র এবং সুবিধা বঞ্চিত মানুষের শিক্ষার ওপর জোর দিয়েছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন যেন এই মানুষগুলোও শিক্ষা লাভ করে নিজেদের জীবন উন্নত করতে পারে। বিবেকানন্দের দেশীয় রাজ্যসমূহে ভ্রমণ ও কৃষি-শিল্প উন্নয়ন সম্পর্কিত প্রচেষ্টা -

বিবেকানন্দ 'তিনি দুঃস্থ মানবের উদ্দেশ্যে জীবন উৎসর্গ করিলেন। ... অক্টোবরের (১৮৯২) শেষে তিনি বাঙ্গালোরের মহারাজার নিকট সুস্পষ্টভাবে বলেন যে, ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি করার জন্য তিনি পাশ্চাত্য দেশগুলিকে অনুরোধ করিবেন এবং উহার বিনিময়ে তিনি ভারতের বেদান্তের বাণী পশ্চিম দেশগুলিতে পৌঁছাইয়া দিবেন। তিনি দেশীয় রাজাদের এ বিষয়ে অবহিত করে উন্নয়নমূলক কাজে প্রেরণা দেবার প্রয়াস পেয়েছিলেন দীর্ঘ পথ পদব্রজে ভ্রমণকালে জনজীবনের অর্থনৈতিক সমস্যাাদি সম্বন্ধে তিনি যে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন যথা হস্তশিল্পের অবক্ষয়, ভূমির উপর জনচাপ বৃদ্ধি, ভূমিস্বত্ব ও রাজস্বক্ষেত্রে ইংরেজদের শোষণমূলক নীতি ও তার পরিণাম প্রভৃতি, তারই ভিত্তিতে ভারতের আর্থিক উন্নয়ন সম্পর্কে তিনি নিজস্ব পরিকল্পনা গড়ে তুলেছিলেন। সেটি তিনি দেশীয় রাজাদের বোঝাতে প্রয়াস পেয়েছেন।

অবশ্য অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, দেশীয় রাজাগণ বা অভিজাত শ্রেণী জনসাধারণের আর্থিক উন্নয়ন ব্যাপারে কিছু করতে আগ্রহী নন। এবিষয়ে তাঁর তিক্ত অভিজ্ঞতা তিনি ব্যক্ত করেছেন একটি চিঠিতে - “কোথায় ইতিহাসের কোন্ যুগে ধনী ও অভিজাত সম্প্রদায়, পুরোহিত ও ধর্মধ্বজিগণ দীনদুঃখীর জন্য চিন্তা করিয়াছে? —তাহাদের ক্ষমতার জীবনীশক্তি ইহাদের নিষ্পেষণ হইতেই উদ্ভূত। চিঠিখানি তিনি লিখেছেন জনৈক দেশীয় রাজার দেওয়ানকে। দরিদ্র জনসাধারণের উন্নয়নের জন্য অতঃপর তিনি যুবকদলকে সজ্জবদ্ধ করবার প্রয়াস করেন। এ বিষয়ে অপর একটি চিঠিতে তিনি লিখলেন - ...আমি এই যুবকদলকে সজ্জবদ্ধ করিতেই জন্মগ্রহণ করিয়াছি। ... ইহারা দুর্দমনীয় তরঙ্গাকারে ভারতভূমির উপর দিয়া প্রবাহিত হইবে এবং যাহারা সর্বাপেক্ষা দীন হীন ও পদদলিত — তাহাদের দ্বারে দ্বারে সুখস্বাচ্ছন্দ্য, নীতি, ধর্ম ও শিক্ষা বহন করিয়া লইয়া যাইবে — ইহাই আমার আকাঙ্ক্ষা ও ব্রত, ইহা আমি সাধন করিব কিংবা মৃত্যুকে বরণ করিব। দেখা যাচ্ছে, এসময়ে ভারতের জনগণের আর্থিক তথা সর্বাঙ্গীণ উন্নয়ন তাঁর ধ্যান-জ্ঞান ও তপস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। শিল্প বাণিজ্য ও কৃষি সমস্যা সম্পর্কে তিনি যে প্রত্যক্ষ জ্ঞান অর্জন করেছেন, তা তিনি কোন গ্রন্থরচনার কাজে লাগাতে প্রবৃত্ত হননি। তিনি সৈনিক, সেজন্য কর্মপ্রয়াসেই তিনি ঝাঁপিয়ে পড়তে চেয়েছেন। তিনি গ্রন্থরচনা না করলেও তাঁর কর্মপ্রয়াস থেকেই আমরা তাঁর অর্থনৈতিক ধ্যান-ধারণা সম্বন্ধে কিছুটা উপলব্ধি করতে পারি। অবশ্য তাঁর বিভিন্ন উক্তি থেকেও আমরা এ ধারণা পাই।

জন-শিক্ষা : স্বামী বিবেকানন্দের ‘জন শিক্ষা’-র মূল ধারণা হল মানুষের মধ্যে আত্ম-অঙ্গীকার, আত্ম-মর্যাদা ও আত্মনির্ভরতা তৈরি করা। তিনি শিক্ষাকে কেবল তথ্য সংগ্রহ বা জ্ঞান অর্জন হিসেবে না দেখে, মানব-গঠন, চরিত্র গঠন এবং সমাজসেবার

চেতনার বিকাশে সহায়তা করার একটি শক্তিশালী মাধ্যম হিসেবে বিবেচনা করতেন। তিনি বিশ্বাস করতেন, শিক্ষা মানুষের মধ্যে সমাজসেবার মানসিকতা তৈরি করতে পারে, যা তাদের দেশের উন্নতি এবং মানুষের কল্যাণে কাজ করতে অনুপ্রাণিত করে।

স্বামীজীর মতে শক্তি-টক্টি কেউ কি দেয়? ও তোর ভেতরেই রয়েছে, সময় হলেই আপনা-আপনিই আসবে। তুই কাজে লেগে যা না; দেখবি এত শক্তি আসবে যে, ভাবতে পারবি। পরার্থে এতটুকু কাজ করলে ভেতরের শক্তি জেগে ওঠে! পরের জন্য এতটুকু ভাবলে ক্রমে হৃদয়ে সিংহবলের সঞ্চার হয়। তোদের এত ভালবাসি, কিন্তু ইচ্ছা হয় তোরা পরের জন্য খেটে খেটে মরে যা — তা যেন আমি দেখে খুশি হই। ভারত মাতা অন্তত সহস্র যুবক বলি চান। মনে রেখো - মানুষ চাই, পশু নয়। ... সমাজের এই নূতন অবস্থা আনবার জন্য সর্বান্তঃকরণে প্রাণপণে যত্ন করবে, মাদ্রাজ এমন কতকগুলি নিঃস্বার্থ যুবক দিতে কি প্রস্তুত — যারা দরিদ্রের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হবে, তাদের ক্ষুধার্ত মুখে অন্ন প্রদান করবে, সর্বসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার করবে, আর তোমাদের পূর্ব-পুরুষগণের অত্যাচারে যারা পশুপদবীতে উপনীত হয়েছে তাদের মানুষ করবার জন্য আমরণ চেষ্টা করবে? ‘মাতৃদেবো ভব, পিতৃদেবো ভব’; আমি বলি, ‘দরিদ্রদেবো ভব, মূর্খদেবো ভব।’ দরিদ্র, মূর্খ, অজ্ঞানী, কাতর — ইহারাই তোমার দেবতা হউক, ইহাদের সেবাই পরম ধর্ম জানিবে। ঈশ্বরকে দেখার জন্য কোথায় যাইতেছ? দরিদ্র, দুঃখী, দুর্বল - সকলেই কি তোমার ঈশ্বর নহে? অথবা তাহাদের উপাসনা কর না কেন? গঙ্গাতীরে বাস করিয়া কূপ খনন করিতেছ কেন? প্রেমের সর্বশক্তিমান বিশ্বাস কর।

“বহুরূপে সম্মুখে তোমার,
ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর?
জীবে প্রেম করে যেই জন,
সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।”^৮

যদি ঈশ্বর-উপাসনার জন্য মন্দির নির্মাণ করিতে চাও তো বেশ, কিন্তু পূর্ব হইতেই উহা অপেক্ষা উচ্চতর মহত্তর মানবদেহরূপ মন্দির তো রহিয়াছে। মানুষের সেবা কর। ... তোমরা বেদী নির্মাণ করিয়া থাক, কিন্তু আমার পক্ষে জীবন্ত চেতন মনুষ্য - দেহরূপ বেদী রহিয়াছে এবং এই মনুষ্য - দেহরূপ বেদীতে পূজা অন্যান্য অচেতন প্রতীকের পূজা অপেক্ষা অনেক বড়।^৯ ভরসা তোমাদের উপর — পদমর্যাদাহীন, দরিদ্র, কিন্তু বিশ্বাসী — তোমাদের উপর। ভগবানে বিশ্বাস রাখ। কোন চালাকির প্রয়োজন নাই; চালাকির দ্বারা কিছুই হয় না। দুঃখীদের ব্যথা অনুভব কর আর ভগবানের নিকট সাহায্য প্রার্থনা কর — সাহায্য আসিবেই আসিবে।

১৯০২ সালের ৪ঠা জুলাই শুক্রবার স্বামীজী এই পৃথিবীর সমস্ত বন্ধন ত্যাগ করে চলে গেলেন। তিনি প্রায়ই বলতেন, ‘আমি চল্লিশ পেরুছি না’ তাঁর একথাও সত্য বলে প্রমাণিত হল। কিন্তু এই স্বল্প বয়সেও পিছনে যে অদ্ভুত কর্মপ্রতিভা রেখে গেলেন তা তুলনাহীন। একটি মানুষ যেন জ্যোতির্মণ্ডল থেকে অকস্মাৎ পৃথিবীতে এসেছিলেন। একমাত্র তিনিই লিখতে পারেন -

“অসীম একাকী আমি, কারণ মুক্ত আমি — ছিলাম মুক্ত, চিরদিন থাকব মুক্ত। ... আঃ কি আনন্দ প্রতিদিন তাকে উপলব্ধি করছি!”^{১০}

এবং মানুষের মনকে সৎপথে পরিচালিত করে, অনন্য প্রতিভায় সমস্ত বিশ্ব জয় করে আবার আপন স্থানে চলে গেলেন। যে কর্মরাশি পিছনে পড়ে থাকল তা চিরকাল ধরে জগতের কল্যাণের পথ নির্দেশ করবে। এবং সেই সঙ্গে বিবেকানন্দও সভ্যতার শেষ দিন পর্যন্ত অমর হয়ে থাকবেন। কারণ মহাত্মা ব্যক্তির মৃত্যু হতে পারে না বা মহাত্মা ব্যক্তির মৃত্যু নেই।

Reference:

১. শ্রী রাজর্ষি উপদেষ্টাঃ, প্রণবেশ চক্রবর্তী, আমি স্বামীজি বলছি- নব গ্রন্থালয় ৫৭/ এ, কলেজ স্ট্রীট (কলেজ রোড) কলকাতা -৭০০০৭৩, সম্পাদনা- সত্যদাস মঙ্গলস, প্রথম প্রকাশঃ শুভ মহালয়া -১৩৯২, পৃ. ১

২. স্বামী বিবেকানন্দ ও ভবিষ্যৎ ভারত, অধ্যক্ষ অমিয় কুমার মজুমদার, অখিল ভারত বিবেকানন্দ যুব মহামন্ডল পৃ. ৬৫
৩. স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী সর্বভূতানন্দ (সম্পাদিত) আমার ভারত অমর ভারত, রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার, গোলপার্ক, কলকাতা, পৃ. ৪৩
৪. মুখোপাধ্যায়, শান্তিলাল, স্বামী বিবেকানন্দের শিক্ষাচিন্তা; স্বামী লোকেশ্বরানন্দ (সম্পাদিত), চিন্তানায়ক বিবেকানন্দ, রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার, কোলকাতা, পৃ. ৫২২
৫. স্বামী প্রভানন্দ, ভারতসংস্কৃতিতে স্বামীজীর অবদান, স্বামী লোকেশ্বরানন্দ (সম্পাদিত), চিন্তানায়ক বিবেকানন্দ, রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার, কোলকাতা, পৃ. ২২৯, ২৩০
৬. প্রাগুক্ত
৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬১
৮. স্বামী বিবেকানন্দ — শিখা প্রসঙ্গ, উদ্বোধন কার্যালয়, বাগবাজার, কলকাতা ৭০০০০৩, পৃ. ১৩০
৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩০
১০. শংকর, অবিশ্বাস্য বিবেকানন্দ, সাহিত্যম, ১৮ বি শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, ৭০০০৭৩ পৃ. ৩৮৪